গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা ২ - ৮ অক্টোবর ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

ধর্মতলা, ম্যান্ডেভিলা, শ্যামবাজার, তারাতলায় সি ই এস সি দপ্তর ঘেরাও

২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সি ই এস সি-র প্রধান দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে অ্যাবেকার বিক্ষোভে পুলিশি হামলা। তারাতলায় সি ই এস সি দপ্তরে বিক্ষোভ (ডানদিকে)

অবিলম্বে ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল কমানো, এমভিসিএ বাতিল এবং সিইএসসি সহ বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্টস তদন্ত করার দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর অ্যাবেকার উদ্যোগে কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক ভিক্টোরিয়া হাউস, শ্যামবাজার, তারাতলা ও ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের রিজিওনাল অফিসগুলিতে বিক্ষোভ দেখান।

ধর্মতলায় বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক ব্যারিকেড ভেঙে সিইএসসি-র কেন্দ্রীয় অফিসের ফটকের দিকে এগিয়ে গেলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ১১ জন বিক্ষোভকারী আহত হন। এঁদের মধ্যে ৪ জনের আঘাত গুরুতর। ৪ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে যান, সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সভায় সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

শ্যামবাজার রিজিওনাল অফিসে সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ দেখান। পরে এপিসি রোড অবরোধ করা হয়। এক ঘন্টা অবরোধের পর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভে পুলিশের সামনেই তৃণমূলের একদল দুষ্কৃতী আক্রমণ চালায়। ৫ জন আহত হন। তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদে থানায় এফ আই আর দায়ের করা হয় এবং এক ঘন্টা রাস্তা অবরোধ চলে।

বেহালা-তারাতলা রিজিওনাল অফিসে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে ১১ জন আহত ও ৩০ জন গ্রেপ্তার হন।

অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী এক বিবৃতিতে এই পুলিশি তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করে বলেন, অতীতে বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর পুলিশি নিপীড়ন চালিয়েও আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারেনি। তৃণমূল সরকার সেই একই কায়দায় দমন পীড়নের রাস্তা নিয়েছে। কিন্তু জনগণের আন্দোলনকে এভাবে দমন করা যায় না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। দাবি পূরণ না হলে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তর ঘেরাও করবেন হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক।

চিকিৎসা খরচ ঃ প্রতি বছর সাড়ে ৬ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে যাচ্ছে

দিল্লিতে ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শত শত রোগী হাসপাতালের বেডটুকুও পাচ্ছে না। দিল্লি দীর্ঘকাল কেন্দ্রশাসিত ছিল, এখন পূর্ণাঙ্গ একটি রাজ্য এবং দেশের রাজধানী। দেশের প্রথম সারির অন্যতম এই মেট্রোপলিটন শহরে স্বাস্থ্যব্যবস্থার এই নৈরাজ্য কেন? কেন দিল্লির স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে এমন বিপর্যস্ত করে রেখেছে পূর্বতন এবং বর্তমানের কংগ্রেস-বিজেপি-আপ সরকার? শুধু কি দিল্লি? মহারাষ্ট্রের মতো ধনী রাজ্যেও স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেহাল। কেন এই দীনতা?

প্রথমে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার জন্য বরাদ্দ বেডের পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যাক। এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে গোয়া। সেখানে বরাদ্দ ১.৭টি। এরপর দিল্লি। সেখানে বরাদ্দ ১.২টি। পরবর্তী রাজ্যগুলিতে, কেরালায় ১.১, কর্ণাটকে ০.৯, উত্তরাখণ্ড-তামিলনাড়ু-পশ্চিমবঙ্গে ০.৮, জম্মু-কাশ্মীর-গুজরাট-রাজস্থানে ০.৬, অন্ধ্র-পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্র-মধ্যপ্রদেশ-ওড়িশায় ০.৪, আসাম-হরিয়ানা-ইউ পি-তে ০.০৩, ঝাড়খণ্ডে ০.২ এবং বিহারে ০.১। অর্থাৎ বিহারে ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য বরাদ্দ মাত্র ১টি বেড। এই অবস্থায় মহামারী দূরের কথা, কোনও রোগের সামান্য বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতাল উপচে পড়বেই। তাহলে রাজ্যে রাজ্যে এত যে উন্নয়নের ঢাক বাজানো হচ্ছে, সেসব কার উন্নয়ন, কী উন্নয়ন?

সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কী উন্নয়ন করেছে, তা বুঝতে হলে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বা সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কী বোঝায় তা দেখে নেওয়া দরকার। ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ কথার অর্থ — ১) সকলকে চিকিৎসার সুযোগ, ২) বিনামূল্যে চিকিৎসা, ৩) প্রান্তিক বা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ মানুষের জন্য বিশেষ গুরুত্ব, ৪) অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা পরীক্ষা করতে বাধ্য না করা, ৫) অতি ওষুধে স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করা, ৬) শহর-গ্রামে চিকিৎসায় একই নীতি অবলম্বন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকেই রোগীর চিকিৎসার সুসমন্বিত প্রয়াস ইত্যাদি আরও কিছু। এই মানদণ্ড সামনে রেখে বিচার করলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ মাশুল ঃ বিধানসভায় মন্ত্রী সত্য আড়াল করেছেন

রাজ্য বিধানসভায় ২৩ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন— সিপিএম সরকারের তুলনায় তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বিদ্যুৎ মাশুল অনেক কম বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, ২০১৩-১৪ সালের পর মাশুল তো বাড়েইনি, বরং কিছুটা কমেছে। আরও বলেছেন, এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি লাভজনকভাবেই চলছে এবং সরকার কোনও ভর্তুকি দেয় না (বর্তমান, ২৩ সেপ্টেম্বর)। তিনি আরও বলেছেন, বিদ্যুতের মাশুল সরকার ঠিক করে না, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ঠিক করে। বিরোধীদের কিছু বলার থাকলে সেখানে গিয়ে বলা উচিত।

বিদ্যুৎমন্ত্রী এও স্বীকার করেছেন, হরিয়ানা সরকার ৬১৯৭ কোটি টাকা ভরতুকি দেয়, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১৮৬ কোটি, ঝাড়খণ্ডে ১০০০ কোটি, দিল্লিতে ১০২৭ কোটি, হায়দরাবাদে ৭২০ কোটি, বেঙ্গালুরুতে ১৩৩৯ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয় (ঐ)।

বামফ্রন্ট আমলের মুখ্য সচিব, দুঁদে আমলা থেকে আজকের বিদ্যুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্ত'র বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার যে, বক্তব্যের সত্যতা কতখানি, আর উদ্দেশ্যই বা কী?

বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছেন, প্রকাশ্য শুনানির মাধ্যমে নাকি আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারিত হয়ে থাকে (২৪ সেপ্টেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকা)। এমন ডাহা মিথ্যা কথা যে একজন মন্ত্রী বিধানসভার সদস্যদের কাছে বলতে পারেন তা ভাবা যায় না। ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যে প্রকাশ্য শুনানির ব্যবস্থা চালু থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে তা বিগত বামফ্রন্টের আমলেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে কথা মন্ত্রী মহাশয় ভালো করেই জানেন। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান বিচারপতি সন্তোষ ফৌজদার প্রকাশ্য শুনানি চালু করেছিলেন। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা তাতে অংশ নিয়ে নানা বিষয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সত্য আড়াল করেছেন

একের পাতার পর

গ্রাহকদের স্বার্থের কথা তুলে ধরেছিল বলে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সেই শুনানি বামফ্রন্ট সরকার বন্ধ করে দেয়। এমনকী চেয়ারম্যান পদে বিচারপতি নিয়োগও বন্ধ করে দেয়। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অ্যাবেকা নেতৃত্ব বিদ্যুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্তের সাথে দেখা করে তাঁকে প্রকাশ্য শুনানির বিষয়টি পুনরায় চালু করার জন্য বলে। কিন্তু তিনি বামফ্রন্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রকাশ্য শুনানি বন্ধ রেখেছেন। আজও তা বন্ধই আছে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রী বলেছেন, ফ্রন্ট আমলের তুলনায় তাদের আমলে মাশুল কম বেড়েছে। প্রকৃত ঘটনা হল বামফ্রন্ট আমলের শুরুতে মাশুল ছিল গড়ে ৭৫ পয়সা ইউনিট, আর বামফ্রন্ট আমল শেষ হওয়ার

ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে

সময় হয়েছিল গড়ে ৪ টাকা ২৭ পয়সা প্রতি ইউনিট। তৃণমূলের শাসন মাত্র ৪ বছর। এই চার বছরের মধ্যেই তারাও মাশুল বৃদ্ধিতে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে! ৪টাকা ২৭ পয়সা থেকে বাড়িয়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত বণ্টন কোম্পানিতে করেছে গড়ে ৬ টাকা ৫৫ পয়সা, আর সি ই এস সি-তে করেছে ৬ টাকা ৯৭ পয়সা ইউনিট। বামফ্রন্ট আমলের বৃদ্ধি ৪৬৯.৩ শতাংশ, আর তৃণমূলের চার বছরে বৃদ্ধি ৬৩.২ শতাংশ। দু'পক্ষই সমান। এ হল একই মুদ্রার দু'পিঠ।

বিদ্যুৎমন্ত্রী আরও একটি অসত্য কথা বলেছেন, তৃণমূল সরকারের রাজত্বে বিদ্যুতের মাশুল বাড়েনি বরং কমেছে। তা হলে উপরোক্ত মাশুল বৃদ্ধি ঘটালো কে এবং কীভাবে? বিদ্যুৎমন্ত্রী যদি বিধানসভায় জানাতেন যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার সময় বিদ্যুতের দাম কত ছিল, আর বর্তমানে কত, তা হলেই মিথ্যাটি ধরা পড়ে যেত। কিন্তু ধূর্ত আমলা ধূর্ততার সাথে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন মিথ্যার ধূম্রজাল। বিদ্যুৎমন্ত্রী এত দিনে একটি কথা স্বীকার করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো লাভজনক অবস্থায় চলছে। এত দিন প্রচার হয়েছিল যে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর লোকসানের শেষ নেই। তাই মাশুল না বাড়িয়ে উপায় নেই। এই মিথ্যাটা এবার ধরা পড়েছে। কোম্পানিগুলো বরাবরই লাভ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কত দিন ধরে লাভজনক? কত লাভ করেছে কোম্পানিগুলো? স্মরণ করা দরকার, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ চালু হওয়ার বছর থেকেই কোম্পানিগুলোর লাভের পরিমাণ বহু গুণ বেড়েছে। ২০১৪-১৫ সালে সি ই এস সি লাভ করেছে ৬১৮ কোটি টাকা। আর সরকার পরিচালিত রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লাভ করেছে ৫০০ কোটি টাকার উপর। প্রতি বছর লাভের হার প্রায় একই। এত বছরের এত লাভ কোথায় গেল? মন্ত্রী মহাশয় জবাব দেবেন কি? একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের যা-খুশি লাভ করতে সরকার দিতে পারে কি? নাগরিকদের মাশুলের বোঝা থেকে রেহাই দিতে কি সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই? বিদ্যুৎ আইন ১৯৪৮-এ বলা হয়েছিল কোম্পানিগুলো ৩ শতাংশের বেশি মুনাফা বা সারপ্লাস করতে পারবে না। এই আইন পরিবর্তন করা হল কেন?

এবার আসা যাক মন্ত্রীকথিত 'দাম কমানো'র নয়া কৌশল সম্পর্কে। মন্ত্রী বলেছেন, ২০১৩-১৪ সালে দাম তো বাড়েইনি বরং ২-৪ পয়সা কমেছে। এটি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার এক নয়া কৌশল মাত্র। ঘটনা হল, বামফ্রন্টের আমলে তৈরি এম ভি সি এ রেগুলেশন প্রয়োগ করে তৃণমূল আমলে সি ই এস সি-তে ৮৭ পয়সা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে ৪৭ পয়সা মাশুল বাড়িয়ে নেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর সি ই এস সি-তে ১ পয়সা, আর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে ২ পয়সা কমিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে — তৃণমূল শাসনে মাশুল কমেছে।

অ্যাবেকা বারবার বলেছে, কৌশলী নয়, সরকার মানবিক, প্রকৃত উন্নয়নমুখী এবং স্বচ্ছ হলেই বিদ্যুতের মাশুল কমে এ রাজ্যে গড়ে ২.৫০ টাকা হতে পারে। দেখিয়েছে, বিশেষজ্ঞ কমিটি 'আসুসি'র মতামত অনুয়ায়ী কোম্পানিগুলোকে প্রতি বছর ১ শতাংশ টেকনিক্যাল লস ও বাণিজ্যিক লস কমাতে বাধ্য করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাপটিভ খনির সব কয়লা কোম্পানিকে উত্তোলন করতে হবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয়

মাভেভিলা গার্ডেনে সি ই এস সি দপ্তরে বিক্ষোভ

করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রতিটি প্ল্যান্টের পি এল এফ ৯০ শতাংশ রাখতে হবে। মাথাভারি প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে হবে। এ সব করা হচ্ছে না কেন? এই বিষয়ে সরকার মুখে কুলুপ এঁটেছে কেন? মাশুল বাড়লে যে সকলের কষ্ট হয়, শিল্প, কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়, তা কি তাদের জানা নেই? এ বছর পশ্চিমবঙ্গে ৪৯ জন আলু চাষি আত্মহত্যা করেছেন। রাজ্যে বৃহৎ শিল্প তো নেই বললেই চলে। ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প উঠে যাচ্ছে। আলুর চপ-বেগুনি দিয়ে তো শিল্প হয় না! লক্ষ লক্ষ বেকার প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে আছে। তা-ও মরীচিকার মতো। এ দায় কি সরকার অস্বীকার করতে পারে?

মন্ত্রী বলেছেন, কলকাতার তুলনায় অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে বিদ্যুৎ মাশুল বেশি। এটাও বিভ্রান্তিকর। দিল্লিতে সর্বনিম্ন মাশুল হল ২ টাকা ১২ পয়সা ইউনিট। তা-ও ২০০ ইউনিট পর্যন্ত। কলকাতায় ছোট গ্রাহকের সংখ্যা বেশি, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত মাশুল ৬ টাকা ৪১ পয়সা ইউনিট। তা হলে কোন শহরে মাশুল বেশি? তথ্যের খেলা খেলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার পথ ছেড়ে সত্যকে স্বীকার করার সাহস দেখানো ভালো।

মন্ত্রী বলেছেন, মাশুল নির্ধারণের দায়িত্ব বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের। কিন্তু এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে যে, এই কমিশন রাজ্য সরকারের দ্বারা গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত। এই তো গত এক বছর চেয়ারম্যান ছিল না কমিশনের, কারণ সরকারের মনমতো লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, কমিশনের কি সরকারের কাছে কোনও দায়বদ্ধতা নেই? সকলেই জানেন, এই কমিশন আজ বিদ্যুৎ কোম্পানির রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। না হলে ২০১৪-১৫ সালে সি ই এস সি-র রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টের থেকে ৩৭.৩৮ কোটি টাকা বেশি অনুমোদন দেওয়া হল কী করে? শুধু তাই নয়, সরকার পরিচালিত কোম্পানি রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ইউনিট প্রতি ২ টাকা ৩৭ পয়সা করে মাশুল বৃদ্ধির জন্য সেন্ট্রাল ট্রাইবুনালে আবেদন করেছে কেন? এ দায়িত্ব কার? একটা সরকারি কোম্পানি কি জনগণের বিরুদ্ধে এ ভাবে মাশুল বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালাতে পারে? সরকারের সবুজ সংকেত ছাড়া কোম্পানি কি তা করতে পারে?

উপরোক্ত দুটি বিষয় বন্ধ করার জন্য যদি সরকার উদ্যোগ নিত তা হলেও বিদ্যুতের দাম কিছুটা কমতে পারত। প্রশ্ন হল সরকার কি মনে করে এ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, গ্রামের কৃষকের জন্য, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের বিদ্যুৎ মাশুল কমানো প্রয়োজন? যদি তা মনে করে, তা হলে তার প্রচেষ্টা কোথায়? সেই কারণেই মাশুল কোথায় কম আছে তার উদাহরণ না দিয়ে খুঁজে বের করছেন কোথায় বেশি আছে। সর্বশেষে বলা যেতে পারে, সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত তা হলে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ১০৮ নং ধারায় যেখানে বলা হয়েছে যে, কমিশনের কোনও সিদ্ধান্ত যদি রাজ্য সরকার মনে করে জনস্বার্থবিরোধী তা হলে তা পাল্টাতে পারে, বর্তমান সরকার সেই ধারায় হস্তক্ষেপ করতে পারত। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলবেন কি তিনি ১০৮ নং ধারায় হস্তক্ষেপ করছেন না কেন? তার একটাই উত্তর, তা হল, বর্তমান সরকার মাশুল বৃদ্ধির পক্ষে। এই মাশুল বৃদ্ধি করে এ সরকার গর্বিত। কারণ এ সরকার বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর।

বিদ্যুৎমন্ত্রী গর্ব করে বলেছেন, তাঁর সরকার ভরতুকি দেবে না। প্রশ্ন হল, যে সরকার বলে ভরতুকিও দেব না, দামও কমাবো না, সেই সরকার কার স্বার্থ রক্ষা করছে? এ কথার মধ্য দিয়ে এটা কি পরিষ্কার নয় যে এই সরকার মাশুল বৃদ্ধির পক্ষে?

ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে

প্রকৃত কথাটা হল মাশুল কমানো। মাশুল কমালে ভরতুকি কেউ চাইবে না, দিতেও হবে না। কিন্তু যে সরকার দাম কমাতে পারবে না, জনস্বার্থের কথা ভাবলে তাকে তো ভরতুকি দিতে হবে। পরিস্থিতি

জীবনাবসান

৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কমরেড নির্মলেন্দু সাউ (৬১) কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে ভুগছিলেন তিনি।

প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল কমরেড নির্মলেন্দু সাউ রামনগর থানায় সেই আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ওই সময়ই দলের বৈপ্লবিক আর্দশের সংস্পর্শে আসেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত এই চিন্তা নিয়ে চলার সংগ্রাম করে গেছেন। অত্যন্ত গরিব পরিবারের সন্তান কমরেড নির্মলেন্দু সাউ দিনমজুরি করে, চা-পান-চানাচুর-বিস্কুটের দোকান করে, সবজি ব্যবসা করে সংসার প্রতিপালন করতেন। কিন্তু দারিদ্র তাঁকে দলের কাজ করা থেকে বিরত করতে পারেনি। গণদাবী বিক্রি ও গ্রাহক সংগ্রহ তো করতেনই, এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, জনগণের নানা সমস্যার প্রতিকারের দাবিতে আন্দোলনেও তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যেত। ২২ সেপ্টেম্বর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্মরণসভায় দলের জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড নির্মলেন্দু সাউ লাল সেলাম

দাঁড়িয়েছে জনস্বার্থের কথা এলেই ভরতুকি তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়, আর যাদের ভুরি ভুরি আছে সেই পুঁজিপতিদের ভরতুকি দেওয়াই এ দেশের রীতি দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের পুঁজিপতিদের ভরতুকি দেওয়া হয়েছে ৩৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং এই পরিমাণ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

আবার বিধানসভায় যে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে সরব হয়েছিল তাদের ইতিহাসটি ভুলে গেলে চলবে না। এই কংগ্রেস আর বাজপেয়ী সরকার মিলেই বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ প্রণয়ন করেছে। তারই পরিণতি আজ লাফিয়ে লাফিয়ে মাশুল বৃদ্ধি।

আর বামফ্রন্ট? ভোলা যায় না, এরাই ভারতের মধ্যে প্রথম বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গে চালু করেছে। সরকারে থাকাকালীন লাঠি-গুলি-জেল দিয়ে দমন করেছে প্রতিরোধ আন্দোলনকে। এই দ্বিচারিতা সম্পর্কেও রাজ্যের জনগণকে সচেতন থাকতে হবে।

জনসাধারণের মনে রাখা দরকার যে, বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা 'অ্যাবেকা'ই এ রাজ্যে বিদ্যুৎ আন্দোলনের যথার্থ শক্তি ও সংগঠন। তাই ভোটবাজ দলগুলির হঠাৎ হুঙ্কারে জনগণ বিভ্রান্ত হবেন না। পাড়ায় পাড়ায় অ্যাবেকার নেতৃত্বে কমিটি গড়ে তুলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত হয়ে আন্দোলনকে ব্যাপকতর এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। এ পথেই দাবি আদায় হবে। মনে রাখতে হবে, আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই।

ইউরোপে শরণার্থী সমস্যা

সভ্যতা ধ্বংসের কারিগর সাম্রাজ্যবাদ

২ সেপ্টেম্বর দুনিয়া তোলপাড় হয়েছিল সোস্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা একটা ছবিতে। তুরস্কের এক সমুদ্র সৈকতে বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে সিরিয়ার বছর তিনেকের শিশু আয়লান কুর্দি। একটু দূরেই পড়ে ছিল তার সামান্য বড় দাদা গালিপ। প্রাণ ছিল না কারও দেহে। প্রাণহীন আয়লানের ছবি যেন চাবুক মেরেছে দুনিয়ার মানুষের বিবেকে। তার পরেও বেশ কয়েকটি শিশুর মৃতদেহ এমন করেই ভেসে এসেছে নানা সৈকতে। হাঙ্গেরির সীমান্তে পরিত্যক্ত মাংসবাহী বদ্ধ ট্রাকের মধ্য থেকে ৭১ জন মানুষের পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনাও বিশ্ব দেখেছে। তারাও ছিল সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া সহ নানা দেশ ছেড়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে চাওয়া শরণার্থীর দল। আরও আছে— হাজার হাজার প্রাণহীন দেহের স্তূপ জমছেই। ইউরোপের নানা দেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে খোলা আকাশের নিচে সন্তান কোলে নিয়ে অপেক্ষা করে আছে কয়েক লক্ষ শরণার্থী পিতা-মাতা। আসন্ন শীতের মরশুমে ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যুই হয়ত তাদের চরম পরিণতি। ইউরোপের বহু দেশ এই আশ্রয়প্রার্থী মানুষগুলিকে ঢুকতে দিতে নারাজ, কারণ তাদের অর্থনীতি সংকটে, অতিরিক্ত মানুষকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান জোগানোর কথায় তারা আতঙ্কিত। এই হাজার হাজার শবদেহ, আর লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হারা মানুষ উত্তর চাইছে তথাকথিত সভ্য পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে— মানব জীবনকে আর কত নিচে নামাবে তোমরা?

রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত দপ্তরের হিসাবে, সিরিয়াতে ৩০ লক্ষ, ইরাকে ১০ লক্ষ, লিবিয়াতে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ যুদ্ধের ফলে আশ্রয়হারা (ইউএনএইচসিআর রিপোর্ট অন নর্থ আফ্রিকা অ্যান্ড মিডল ইস্ট-২০১৫)। বাঁচার তাগিদে ১০ লক্ষের বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছে ইউরোপের উদ্দেশে। এই সুযোগে তৈরি হয়েছে মানুষ পাচারের চক্র। মানুষের অসহায়তার সুযোগে তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে তারা। বেশি লাভ করার জন্য ছোট নৌকায়, বদ্ধ ট্রাকে গাদাগাদি করে মানুষ চালান দিতে যাওয়ার পরিণামে অগুন্তি মানুষের প্রাণ গেছে। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বত থেকে শুরু করে সাহারা মরুভূমির পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার হাজার হাজার মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল যুদ্ধবিধ্বস্ত। মানুষের স্বাভাবিক জীবন বলে কিছুই নেই। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে শুধু ২০১৫ সালের মধ্যেই ৬ হাজারের বেশি মানুষ ভূমধ্যসাগরের জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে। সমুদ্রে ভেসে যাওয়া ফুটফুটে শিশুদের নিথর ছোট্ট দেহগুলি মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে বালিতে, যেন বিবেকবান মানুষকে বলছে এই কি আমাদের প্রাপ্য ছিল? আমাদের জন্মভূমি দেশগুলি তো অতীতে একদিন বিশ্বের মানুষকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছিল। আধুনিক যুগে সে দেশের মানুষের হাড় ভাঙা পরিশ্রমে সারা দুনিয়া পেয়েছে সভ্যতার চালিকাশক্তি খনিজ তেল। কেন আজ কুকুর বেড়ালের থেকেও নিকৃষ্ট মরণ মরতে হচ্ছে সেইসব দেশের মানুষকে?

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং তার সর্দার জার্মানি দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা নিয়ে চোখ বুজে থাকার ভান করলেও, শেষ পর্যন্ত শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। এমনকী ব্রিটেন প্রথমে শরণার্থীদের প্রবেশ আটকাতে চাইলেও, পরে কিছু সংখ্যক শরণার্থীকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই জার্মানি সহ সব দেশ বলতে শুরু করেছে, এবার নিয়ন্ত্রণ, আর শরণার্থী নেবে না তারা। কারণ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে চলছে ঘোরতর অর্থনৈতিক সংকট। তার ফলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাজের ব্যবস্থা ও ভরণপোষণ কী করে হবে, তা নিয়ে আশঙ্কার মেঘও ঘনিয়েছে। আশ্রয়হারা মানুষগুলির সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরোধের জমিও তৈরি করছে ধুরন্ধর উগ্র জাতিবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তা বড় আকার নেবে। আবার ফ্রান্স ইতিমধ্যেই যেভাবে সিরিয়ায় আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে, তাতে অনেকের এও আশঙ্কা যে, সিরিয়ার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের জমি তৈরি করার জন্যই হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে শরণার্থীদের দুঃখে আকুল হয়ে উঠছে সাম্রাজ্যবাদীরা।

ইউরোপের বহু দেশ এই শরণার্থীদের ঢুকতে দিতে নারাজ। বিশেষত হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়ার মতো যে দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পতন-পরবর্তী সময়ে জার্মান-মার্কিন মদতে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় বসেছিল, তারা আওয়াজ তুলছে, শরণার্থীরা এলে ইউরোপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিপন্ন হবে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত সিল করে মানুষকে আটকে রেখেছে তারা। হাঙ্গেরির পুলিশ বাহিনী খাবার ছুঁড়ে দিচ্ছে চিড়িয়াখানার পশুদের মতো কাঁটাতারের বেড়ায় আবদ্ধ ক্ষুধার্ত মানুষগুলির দিকে, সেই ভিডিও ছবি দেখলে বিবেকবান মানুষের পক্ষে চোখের জল সংবরণ করা কঠিন। এই অমানবিকতা যে চরম দক্ষিণপন্থী নব্য ফ্যাসিস্ট আদর্শের সৃষ্টি এবং সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার জমি তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শরণার্থীদের আশ্রয়ের পক্ষ নিয়ে রাস্তায় নামলেও সে সব দেশেও ধর্ম এবং উগ্র জাতিবাদের ভিত্তিতে শরণার্থীদের বিরোধিতা করছে একদল লোক।

মধ্যপ্রাচ্যের বিরামহীন গৃহযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যার মূল কারণ কী? ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের পর ইরাক এবং সিরিয়া জুড়ে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিগির তুলে যে মৌলবাদী শক্তি আইসিস গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকায় হত্যালীলা চালাচ্ছে, তাদের নিজের কোনও অস্ত্র কারখানা নেই, তাহলে তারা এই বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্র পাচ্ছে কোথা থেকে? পাচ্ছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইজরায়েল, জার্মানি ইত্যাদি দেশের অস্ত্র কোম্পানিগুলির কাছ থেকে। ইউরোপিয়ান

সংবাদমাধ্যমে এ কথাও বেরিয়েছে, জার্মান অস্ত্র কোম্পানিগুলি একদিকে আইসিসকে রোখার নাম করে কুর্দদের অস্ত্র দিচ্ছে, অন্য দিকে তারাই আরব ধনকুবেরদের মাধ্যমে আইসিস-কে অস্ত্র বেচে প্রচুর লাভ করছে। ইরাক ও সিরিয়াতে আইসিসকে বলীয়ান করতে সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরশাহির ধনকুবেররা যে কুবেরের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে প্রস্তুত তা স্বীকার করেছেন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জো বিডেন স্বয়ং। এই তিন দেশই এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি রূপে কাজ করছে। এই প্রচেষ্টাকে শুধু শিয়া প্রধান ইরাক-ইরান আর সুন্নি প্রধান সৌদি আরবের জাতিগত বিদ্বেষ বলে দেখলে সমস্যাটা পুরোটা বোঝা যাবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্য প্রাচ্যের তেল ভাণ্ডারকে পুরোপরি কবজায় আনতে তাদের অনুগত নয় এমন সব শাসককে এই এলাকা থেকে খতম করে অনুগত শাসক বসাতে চেয়েছে। এর জন্য সামরিক অভিযান থেকে শুরু করে গোপন ষড়যন্ত্র কিছুই বাদ দেয়নি তারা। এর জন্য এই তিন দেশের সাহায্যে এই সমস্ত এলাকায় জাতিবিদ্বেষ, মৌলবাদী অন্ধতার প্রসার ঘটাতে মদত দিয়েছে, তেমনি সাদ্দাম হোসেন বা গদ্দাফির মতো মার্কিন অনুগত নয় এমন শাসকদের সামরিক শক্তির জোরে ধ্বংস করেছে। মধ্য প্রাচ্যের তেল জাহাজে স্থলপথে রপ্তানির জন্য সিরিয়ার অবস্থানগত ও সামরিক গুরুত্ব খুবই বেশি বলে মার্কিন শাসকরা সেখানেও আসাদ সরকারকে হঠিয়ে তাদের অনুগত শাসক বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু নানা ভাবে গৃহযুদ্ধ বাধিয়েও তা সম্ভব না হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট আইসিস, আল কায়দা সহ সমস্ত চরম মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীকে এককাট্টা করার কাজে আরবের শাসক ও ইজরায়েলের সাহায্য নিচ্ছে। এখন শুধু শিয়া-সুন্নি লড়াই নয়, এই এলাকায় অসংখ্য উপজাতিদের মধ্যে যত দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার সবগুলিকে খুঁচিয়ে তুলে প্রত্যেকটি উপজাতিকে কোনও না কোনও উপজাতির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কুর্দদের বিরুদ্ধে তুরস্ক সরকার যে একটানা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তার মদতদাতাও আমেরিকা।

যে সমস্ত শাসকরা উপজাতীয় কোন্দল, জাতিবাদী দাঙ্গাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তাদের সকলকে ধ্বংস করার ফলে আজ মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় মানবসমাজ পুরোপুরি বিধ্বস্ত। যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন লিবিয়ার শাসক মুয়াম্মার গদ্দাফি ২০১১ সালে মার্কিন মদতপুষ্ট বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার কয়েকদিন আগে— 'ন্যাটোর পাণ্ডারা শোনো, তোমরা এমন একটা দেওয়ালের উপর বোমা ফেলছ, যা দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে শরণার্থী স্রোতের গতি রোধ করে। আলকায়দা জঙ্গিদের পথেও এই দেওয়াল বাধা দিচ্ছে। এই দেওয়ালটার নাম লিবিয়া। তোমরা তাকে ধ্বংস করছ। মূর্খের দল, তোমরা আফ্রিকা থেকে ইউরোপে হাজার হাজার শরণার্থীর ঢল ডেকে আনছ, আল কায়দাকে সাহায্য করছ এর ফলে যে নরক সৃষ্টি করছ তার আগুনেই তোমরা দগ্ধ হবে' (রাশিয়ান সংবাদপত্র জাভভ্রায় লুদমিল্যা আলেক্সান্দ্রোভা-র প্রবন্ধে উদ্ধৃত)। আজ লিবিয়া বিধ্বস্ত, জনসংখ্যার অর্ধেক আশ্রয় নিয়েছে তিউনিশিয়াতে, সেখানেও তাদের উপর চলছে হানাদারি। দুর্গত মানুষের উদ্দেশে জার্মান চ্যান্সেলারের আবেগতাড়িত হওয়ার নাটক, আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামার ফাঁকা বুলিতে কি সব অপরাধ ধুয়ে যাবে? এই শরণার্থীদের মৃত্যু, তাদের যন্ত্রণার দায় এই সব সাম্রাজ্যবাদী দানবদের নিতে হবে না?

সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধের প্রমাণ দিয়েছে মার্কিন সামরিক সংস্থা পেন্টাগন। সম্প্রতি তাদের কিছু ডিক্ল্যাসিফায়েড ফাইল থেকে জনস্বার্থ-আইন বিষয়ক মার্কিন সংস্থা 'জুডিশিয়াল ওয়াচ' দেখিয়েছে, আমেরিকা এবং তার অন্যান্য ইউরোপিয় দোসররা সিরিয়াতে আসাদ সরকারকে উচ্ছেদ করতে পরিকল্পিতভাবে আল কায়দা এবং তার সহযোগীদের সাথে হাত মিলিয়ে চলেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এই নথি দেখিয়েছে তিন বছর আগেই উগ্র ধর্মান্ধ 'ওয়াহাবি সালাফি' নীতির বাড়বাড়ন্তকে সাহায্য করেছিল পেন্টাগন, কারণ তাতে জাতিদাঙ্গা লাগিয়ে সিরিয়া সরকারকে বিপদে ফেলা যাবে। পশ্চিম এশিয়ায় সবচেয়ে বড় মার্কিন দোসর ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে ইয়ালন জানিয়েছেন মার্কিন মদতপুষ্ট ফ্রি সিরিয়ান আর্মি যা আইসিস-এর অন্যতম শাখা হিসাবেই কাজ করছে, তাদের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে ইজরায়েল। ২০১৪ সালের ২৯ জুন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, আইসিস-এর কার্যকলাপের ফলে ইজরায়েলের সুবিধাই হবে।

আজ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের দেখে এই সব সাম্রাজ্যবাদীরা কুমিরের কান্না কাঁদছে। অথচ তারা একবারও উচ্চারণ করছে না, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মানুষের এই অবস্থা হল কেন? একবারও বলছে না আইসিস-এর পিছনে যারা মদত দিচ্ছে তাদের শাস্তি চাই। কারণ তীরটা তাহলে তাদের দিকেই ফিরে আসবে। আমেরিকা এবং ইউরোপের এই শাসকবর্গ সকলেই এই যুদ্ধ চক্রান্তে সরাসরি যুক্ত। মার্কিন ব্রিটিশ বাহিনীর দখলদারিতে থাকার সময় শীতের দিনে আফগানিস্তানের কাবুল উপত্যকায় বরফে জমাট শত শত শিশুর মৃতদেহের ছবি কি বিশ্ব ভুলে যাবে? আফগানিস্তান থেকে মধ্য প্রাচ্য হয়ে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত যেখানেই মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ মাথা তুলেছে, সাম্রাজ্যবাদী এই জোট তাদের আক্রমণ করেছে। ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে 'সউর' বিপ্লব রাজতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এই বিপ্লবের উপর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের প্রভাব আছে এই অজুহাতে আমেরিকা ও তার সহযোগীরা বিপুল অর্থ খরচ করে উপজাতীয় সর্দারদের ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে এবং তাদের হাতে অস্ত্র জুগিয়ে নানা গোষ্ঠী তৈরি করে। তখনই তৈরি হয় মুজাহিদিন গোষ্ঠীগুলি। ১৯৮৮ সালে আমেরিকাই সৌদি আরবের ওসামা বিন লাদেনকে মদত দিয়ে আল কায়দা তৈরি করতে সাহায্য করে।

সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানুষ আজ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের দুঃখ, যন্ত্রণায় ব্যথিত। আশার কথা ইউরোপ সহ সারা দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ অসহায় মানুষগুলির প্রতি সহমর্মী হয়ে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এই মানুষগুলি তো দয়া নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়না। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিজের জমি থেকে, জীবন থেকে উৎখাত করার মূল হোতা যারা, সেই মার্কিন ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে এত মানুষের চোখের জলের প্রকৃত মূল্য দেওয়া যাবে না। মানব সভ্যতার এই বিপর্যয়ের দিনে স্মরণ করা দরকার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের শিক্ষা— যতদিন

ছয়ের পাতায় দেখুন

জলপাইগুড়িতে বন্যার্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত দোমোহনী তিস্তা চর এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে তিস্তার বাঁধ ভেঙে সম্পূর্ণ গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় ৭০০ পরিবার কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে তিস্তা নদীর বাঁধের উপর আশ্রয় নেয়। ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ওই এলাকায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর পঞ্চম শ্রেণি থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত দুইশত ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা ও কলম দেওয়া হয়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে নদীয়ায় বিক্ষোভ

নদীয়া জেলার তেহট্ট-২ ব্লকের 'কৃষক বাঁচাও কমিটি'র পক্ষ থেকে প্রায় সহস্রাধিক চাষি ২২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। অতিবর্ষণের ফলে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলির কুল, পেয়ারা ও সবজি চাষিরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন জল জমে থাকার দরুন অধিকাংশ গাছই নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ এলাকা পরিদর্শন না করেই ব্লক অফিস থেকে জানানো হয়, ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ মাত্র ২৫০ বিঘা। বাস্তবে যার পরিমাণ কয়েক হাজার বিঘা।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বিঘা প্রতি ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, পরবর্তী চাষের জন্য বিনামূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক ও চারাগাছ সরবরাহ, কৃষিঋণ মকুব, কৃষি পেনশন ও বিমার সুযোগ সহ সাত দফা দাবিসনদ ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার-এর কাছে পেশ করা হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জমজাহান মণ্ডল ও সম্পাদক ফজলুর রহমান। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ প্রশাসনের দেওয়া হিসাবেরও কয়েক গুণ বেশি, এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন ডেপুটি ডাইরেক্টর। তিনি পুনরায় পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ জানাবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সবুজ মল্লিক, লহিরউদ্দীন সেখ, মহিউদ্দীন মণ্ডল, প্রবীর দে প্রমুখ।

জনগণের নানা দাবিতে বীরভূমের ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ

অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে চাষিদের সার-বীজ-কীটনাশক প্রদান ও কৃষিঋণ মকুবের দাবিতে এবং খাদ্য সুরক্ষার নামে রেশনের সুযোগ কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন, মদ-জুয়া-সাট্টার প্রসার, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি প্রতিরোধ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বীরভূমের মুরারই, বোলপুর, নলহাটি, সিউড়ি ও রামপুরহাটে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। ৮ সেপ্টেম্বর মুরারই-এর বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান। বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সঞ্জয় বর্মন ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিজয় দলুই। বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নলহাটি ব্লকে ২১ সেপ্টেম্বর বিডিও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম। সিউড়ি ১ নং ব্লকে কড়িধ্যা বিডিও অফিসে ২৩ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস স্বাধীন দলুই ও কার্তিক হাজরা। ওই দিনই রামপুরহাট বিডিওতে বিক্ষোভ হয়। মাড়গ্রাম রোডে এক ঘন্টা পথ অবরোধ হয়। নেতৃত্ব দেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আতাহার রহমান ও আয়েষা খাতুন।

মুরারইতে বিক্ষোভ

নেতুড়িয়া ব্লক অফিস ঘেরাও অভিযান

প্রতিটি গ্রামে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট সংস্কার, অধিগৃহীত জমিতে শিল্প স্থাপন ও জমিদাতাদের চাকরিতে অগ্রাধিকার, ব্লক এলাকার হাসপাতালগুলির উন্নয়ন, স্পঞ্জ আয়রন দূষণ রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালু করা সহ নারী নিগ্রহ প্রতিরোধের দাবিতে এবং মদের ব্যাপক প্রসারের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ার নেতুড়িয়া ব্লক অফিস ঘেরাও অভিযান করে এস ইউ সি আই (সি) নেতুড়িয়া ব্লক কমিটি। পাঁচ শতাধিক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে গোবাগ মোড়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস নবনী চক্রবর্তী, জিতেন মাজি সহ অন্যান্যরা। এরপর বিডিও অফিসের গেট দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি ব্লক স্তরের দাবিগুলি আগামী তিন মাসের মধ্যে কার্যকর করবেন এবং অন্যান্য দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস কেষ্ট বাউরী ও অনিল বাউরী।

এ আই ডি এস ও-র হায়দরাবাদ জেলা সম্মেলন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানাল এ আই ডি এস ও-র হায়দরাবাদ জেলা সম্মেলন। ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন সুপরিচিত কবি হিমাজবালা। এস ইউ সি আই (সি)-র হায়দরাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সি এইচ মুরাহরি এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর উপস্থিত ছিলেন। কমরেড জে মল্লেশ রাজকে সভাপতি, কমরেড এ সত্যনারায়ণকে সম্পাদক করে ৩২ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

মধ্যপ্রদেশে অধ্যাপকদের উপর বিজেপি সরকারের ব্যাপক লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

সম কাজে সম বেতন সহ অন্যান্য কয়েকটি ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে মধ্যপ্রদেশের অধ্যাপকরা ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে উল্টে তাঁদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। সরকারের সর্বশেষ আক্রমণ নেমে আসে ২৫ সেপ্টেম্বর। যখন শিক্ষকরা রাজ্যস্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে আসছিলেন, তখন বিভিন্ন রেলস্টেশন ও অন্যান্য স্থান থেকে পুলিশ হাজার হাজার অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করে। আন্দোলন দমন করার জন্য এর আগেই শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিপূর্বে স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনের উপরেও বিজেপি সরকার ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে তার স্বৈরাচারী চরিত্র প্রকাশ করেছে। ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটি বিজেপি সরকারের এই চণ্ডনীতি অবিলম্বে বন্ধ করার এবং অধ্যাপকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

৪৪ নং জাতীয় সড়ক দ্রুত সংস্কারের দাবি ত্রিপুরায়

অবিলম্বে ৪৪ নং জাতীয় সড়ক সংস্কার করার দাবিতে রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি। এই জাতীয় সড়ক আসাম, মেঘালয়ের উপর দিয়ে ত্রিপুরা ও মিজোরামকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই সড়ককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা বলে থাকেন লাইফ লাইন বা জীবনরেখা। বর্তমানে বেহাল এই রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের একমাত্র রেলপথ মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু হওয়ায় ট্রেন চলাচলও বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই অন্য রাজ্যে যাওয়া এবং পণ্য পরিবহণে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমনকী পেট্রল ডিজেল রান্নার গ্যাসও নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে না। জনজীবন অসহনীয় অবস্থায় পড়েছে। সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদেরও কোনও তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি ২২ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ করে। বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য রাজ্যপালকেও অনুরোধ জানান তাঁরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস অরুণ ভৌমিক, শিবানী দাস, সুব্রত চক্রবর্তী, সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ।

মদবিরোধী বিক্ষোভ বহরমপুরে

প্রতি কিলোমিটারে একাধিক মদের দোকান খোলার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার, অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর এ আই এম এস এস মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির ডাকে খাগড়া চৌরাস্তা মোড় থেকে দু'শতাধিক মহিলার সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল জেলাশাসক এবং আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। গ্রাম ও শহর থেকে আগত শ্রমিক, মধ্যবিত্ত মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ৪ জনের প্রতিনিধি দল ডি এম দপ্তরে এবং ৪ জনের প্রতিনিধি দল আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়।

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে স্মারকলিপি ছাত্রছাত্রীদের

ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাস ভাড়া এক-তৃতীয়াংশ করা এবং সব বাসস্ট্যান্ড থেকেই ছাত্রছাত্রীদের বাসে তোলার দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে স্মারকলিপি দিল এ আই ডি এস ও মালবাজার ইউনিট। সংগঠনের পক্ষে কমরেডস মনোজ রায়, আকাশ ওঁরাও বলেন, ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ১৫ টাকা কমেছে, ভাড়া কমানোর দাবি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সদস্য কমরেড ঝর্না রায় জানান, পাশ-ফেল প্রথা চালুর দাবিতে ২১ সেপ্টেম্বর রাজভবনের সামনে বিক্ষোভে লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর শতাধিক ছাত্রছাত্রী ধূপগুড়িতে মিছিল ও ধিক্কার সভা করে।

শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীতে আলোচনা সভা

শরৎচন্দ্রের ১৩৯তম জন্মবার্ষিকীতে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস, কমসোমল এবং পথিকৃৎ-এর উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে 'পার্থিব মানবতাবাদ— বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র' বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী। সভার শুরুতে 'সাম্পান' গোষ্ঠীর সদস্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী পালন

নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস ২৬ সেপ্টেম্বর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সংস্থা এবং ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস, কমসোমল সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, প্রভাতফেরি, সভা প্রভৃতির মাধ্যমে পালন করা হয়। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেভ এডুকেশন কমিটি দিনটিকে শিক্ষা বাঁচাও দিবস হিসাবে পালন করে।

ত্রিপুরায় বিদ্যাসাগর স্মরণ

আগরতলার বটতলায় ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস-এর উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাল্যদান করেন ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার, ডি ওয়াই ও রাজ্য সভাপতি কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী এবং এম এস এসের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড শিবানী দাস। বিভিন্ন স্কুলে ডি এস ও-র উদ্যোগে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং ছবি সংবলিত ব্যাজ পরানো হয়।

বালিচকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচক স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে এক মহিলাকে দুষ্কৃতীরা ধর্ষণ করে। এই বর্বরতার প্রতিবাদে বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটি এলাকার সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে ডেবরার বিডিও, ওসি এবং বালিচক স্টেশন ম্যানেজারের কাছে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়। কমিটির দাবি অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। স্টেশন সংলগ্ন পাওয়ার হাউস এবং আর পি এফ ব্যারাকের কাছে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, রাতে স্টেশন চত্বরে পুলিশি পাহারা ও লেভেল ক্রসিংয়ে পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কিংকর অধিকারি, কালীশংকর গাঙ্গুলি, রীণা সামন্ত, আভা গাঁতাইত, ইলা জানা, ঈশ্বর মান্ডি, শিবানী গাঙ্গুলি, শ্যামলী পাত্র প্রমুখ।

বালিচক স্টেশনের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটি ৮ সেপ্টেম্বর জেলাশাসককে দাবিপত্র পেশ করে।

'স্বচ্ছ ভারত' এক প্রহসন

নেহেরুজির প্রধানমন্ত্রীত্বে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথ পার হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর গরিবি হঠাও-এর ভারতবর্ষ ছুটতে ছুটতে এল রাজীব গান্ধীর 'মেরা ভারত মহান'-এ। সেখানেও বিরাম নেই। নরসীমা-মনমোহনের 'উদার ভারত' উন্নয়নের দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। কংগ্রেসি সরকারগুলোর ঐ দুরন্ত গতির পথের মাঝে আবার বিজেপির অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ 'ঝলমল' করে উঠেছিল। সেই চোখ ধাঁধানো উন্নয়নের পথ পার হয়ে এল মনমোহনের দু'কিসিম 'ভারত উন্নয়ন'। এখন মোদির নেতৃত্বে 'ঝলমলে' ও 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযান চর্তুদিক কাঁপিয়ে দিচ্ছে। জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করছে মাত্র পাঁচ শতাংশ ধনী! সরকারের উদারনীতিতে এরা ঝলমল করছে।

লাগাতার দেশ এগিয়ে চলছে, ভারতের উন্নয়ন এগিয়েই চলেছে। গরিব কমেই চলেছে, গরিব কারা তা ঠিক করার মান কমানোর জন্য শত শত কোটি টাকা খরচ করে পণ্ডিত ভাড়া করে ফর্মুলা তৈরি হয়েছে। অঙ্কের প্যাঁচে গরিব উধাও হয়ে যাচ্ছে। ধনীর ভারত উন্নয়নের হিমালয়ের মাথায় উঠেছে। কোটি কোটি গরিব ভারতবাসী সেই উন্নয়নের ভয়াবহতায় কাঁপছে, শিউরে উঠছে। কোটিপতিরা হাসতে হাসতে বলছে ভয় নেই। তোমরা দৃষ্টিটা ঠিক করে নাও, তবেই তো উন্নয়ন দেখতে পাবে, দেখতে গেলে চোখ চাই। এমন করে স্বাধীনতার পর ৬৮ বছর পার হয়ে গেল। সমস্ত প্রচার যন্ত্রে হৈ হৈ করে বলা হচ্ছে 'স্বচ্ছ ভারত', 'ঝলমলে ভারত', 'ডিজিটাল ভারত', এমন কত কী!

২০১৪ সালের ১৩ নভেম্বর মোদিজির গুজরাটের একটি ছবি — এক মহিলা মাথায় করে মানুষের বর্জ্য বহন করে নিয়ে চলেছেন (প্রকাশিত হয়েছিল 'দি স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে)। ২০১১ সালে সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় এ দেশে এখনও ২৬ লক্ষ ৬ হাজার ২৭৮টি খোলা শৌচাগার আছে। ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৯০ জন 'মানুষ' এগুলি সাফাই করার কাজে নিযুক্ত। জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ পুরুষ ও মহিলা সকলেই শরীরের বর্জ্য ত্যাগ করে খোলা জায়গায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শৌচাগার নেই। সাফাই কর্মীদের মধ্যে ধরা হয় যারা রাস্তাঘাট, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড প্রভৃতি ঝাড়ু দেয়। যারা নর্দমা পরিষ্কার করে, ট্রেন লাইনের মলমূত্র সহ নানা জঞ্জাল পরিষ্কার করে, স্টেশন বাসস্ট্যান্ড প্রতিটি শহরের বিভিন্ন পাবলিক টয়লেট সাফাই করে, মরা জীবজন্তু, মৃতদেহ বহন করে, টয়লেটের সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল গর্ত থেকে কাঁচা নোংরা বর্জ্য মাথায় করে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসা— এরা 'মেথর', 'ভাঙ্গি', 'বাল্মিকী' বলে পরিচিত। বাল্মিকীরা হল 'দলিত হিন্দু'। হেলাল খোর হল 'দলিত মুসলমান'। উত্তর ভারতে এভাবেই তারা পরিচিত। দক্ষিণে 'খোটি', 'মাভি' ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই পেশায় যারা নিযুক্ত তারা সকলেই দলিত সম্প্রদায় এবং বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে। কোটিপতি দলিতও আছে, তাদের কথা অবশ্যই এখানে বলা হচ্ছে না। এরা সকলেই সমাজের একবারে নিম্নবর্গের মানুষ। এই সর্বহারা হতদরিদ্র, অশিক্ষিত দলিতদের মধ্যেই নারী পুরুষ শিশু-কিশোররা 'নিচু' জাতির তকমা নিয়ে এই বৃত্তিতে নানা ভাবে লিপ্ত থাকে। এদের কোথাও দেওয়া হয় নগদ মজুরি, কোথাও কিছু শস্য, কিছু পোশাক-আশাক, অল্প অংশই সুনির্দিষ্ট বেতন, অবসরকালীন সুবিধা বা অন্য কিছু খয়রাতি সাহায্য পায়। উচ্চবর্ণের স্বাভাবিক পীড়ন, অবহেলা, ঘৃণায় এরা সমাজে ব্রাত্য হয়ে মূলত ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করে যায়। ঝুপড়ি বস্তিতে জীবন কাটায়। দারিদ্র্যসীমার নিচের এই মানুষগুলির জীবন অন্ধকারময়। বছরের পর বছর, কোনও রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই সাফাই কর্মীরা জঞ্জাল, নোংরা পরিষ্কার করছে সমস্ত শহরের পৌর কর্মে, হাসপাতালের সাফাই কাজে। রেলে সর্বত্র এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের বাদ দিয়ে সমাজের নাগরিক জীবন অচল। অথচ টয়লেট, ড্রেন, রাস্তা, সেপটিক ট্যাঙ্ক সব কিছুই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু করা হয় না। ন্যূনতম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই অনাবৃত শরীরে নিয়মিত নোংরা ঘাঁটার ফলে এরা সহজেই কতকগুলি শারীরিক সমস্যার, ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ে। নানা রকম রোগ, চর্ম রোগ, শ্বাসকষ্ট, রক্তাল্পতা ইত্যাদিতে ভোগে। বড় বড় শহর— কলকাতা, দিল্লি সহ নানা জায়গায় গভীর ড্রেন পরিষ্কার করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে মারা যায় অনেকেই। শিক্ষার সুযোগের অভাব, উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাব, পানীয় জলের অভাব ইত্যাদি এদেরকে মানবেতর জীবনযাত্রায় বাধ্য করে। এরই সঙ্গে থাকে সমাজের চোখে অমার্যাদা। এগুলির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার দরুন এদের মনে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে এক অজানিত বিদ্বেষ দেখা যায়, যা তাদের প্রায়শই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রায় ঠেলে দেয়। আশাহীন জীবনের উদ্ভূত গতিপ্রকৃতি এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার নিচু তলার এই পিলসুজ সাফাই কর্মীরা নিজেরাই সম্পূর্ণ অরক্ষিত, অবহেলিত।

মানুষের দ্বারা মানুষের বর্জ্য পরিষ্কার করবার প্রথা সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে। ভূগর্ভস্থিত ঢাকা ড্রেনের মধ্যে দিয়ে শরীরের বর্জ্য হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োতে সাফাই করার সুব্যবস্থা থাকলেও সভ্য আধুনিক ভারতে তা করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সুদূর অতীতকাল মানুষ কর্তৃক বর্জ্য পরিষ্কার করার প্রথা চলে আসছে শুধু নয়, এই পেশায় নিযুক্ত হয়েছে 'নিম্নবর্ণ' 'নিচুজাত' বলে পরিচিত মানুষগুলি। জাতপাতের বিভাজনের সাথে এই পেশা মিশে আছে। নারদ সংহিতাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও মৌর্য যুগের সমাজ ব্যবস্থাতেও। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ আমলে পৌরসভা এলাকায়, পার্কে, রাস্তার সাফাই-এ গণ শৌচালয়ে নর্দমা পরিষ্কারে নিম্নবর্গের মানুষকেই নিযুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক ডিজিটাল ভারতে, আণবিক শক্তি সম্পন্ন ভারতে আজও এই ঘৃণ্য ট্র্যাডিশন চলছে। আজও চলতে পারছে কেন?

শুধু গুজরাট নয়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যেই মানুষ খোলা হাতে অত্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় নোংরা, আর্বজনা, ড্রেন সাফাই ও শারীরিক বর্জ্য সাফাই কাজে যুক্ত হয়ে আছে। প্রশ্ন জাগে — এই কু-ব্যবস্থার কি কোনও শেষ নেই?

২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই পেশা সম্পর্কে কিছু রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছে দেশে ৯৬ লক্ষ মানুষ এই পেশায় নিযুক্ত। ১৯৫০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী জি এস লক্ষ্মণ আয়ার সর্বপ্রথম গোবিচেট্টিপোলিয়াম পৌর এলাকায় মানুষের হাতে এই নোংরা সাফাইকে নিষিদ্ধ করেন। স্যানিটেশন— সংবিধানের ৬নং ধারায় রাজ্যের বিষয়। ২০১৩ সালে দিল্লি সরকার মানুষের হাত দিয়ে ময়লা সাফাই বেআইনি ঘোষণা করে। ভারতে এটিই প্রথম রাজ্য। সিদ্ধান্ত হয় তিনবছরের মধ্যে সমস্ত পৌর এলাকায় রেলপথ, ক্যান্টনমেন্ট, এলাকায় এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে জলপাইগুড়িতে পথ অবরোধ

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে জলপাইগুড়ি শহরের রায়কতপাড়া এলাকায় ২১ সেপ্টেম্বর পথ অবরোধ করা হয় এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে। এ ছাড়া বেরুবাড়ি মোড়, রাজগঞ্জ, ধুপগুড়ি এলাকাতেও পথ অবরোধ করেন দলের কর্মীরা। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মোট ৬টি জায়গাতে পথ অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি এই দাবিতে ময়নাগুড়িতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন দলের কর্মী সমর্থকরা। (উত্তরবঙ্গ সংবাদ-২২.০৯.২০১৫)

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ২১ সেপ্টেম্বর দুপুরে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী সমর্থকরা জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার বাসস্ট্যান্ড এবং জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রোডের বেরুবাড়ি মোড়ে পথ অবরোধ করে। (আনন্দবাজার পত্রিকা-২২.০৯.২০১৫)

সালানপুরে প্রধানের কাছে দাবিপত্র প্রদান

বিপিএল তালিকাভুক্তদের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ ও ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি প্রদান, ১০০ দিনের কাজ চালু করা, একজন শিক্ষক পরিচালিত ন্যাকড়াজোড়িয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, সমস্ত গরিব বিধবা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেনশন প্রদান, গরিব পরিবারগুলির জন্য বিনামূল্যে শৌচালয়, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি দাবিতে ২১ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের সালানপুর ব্লকের দেন্দুয়া পঞ্চায়েতের সমস্ত গ্রাম থেকে আসা দুই শতাধিক গরিব মানুষ পঞ্চায়েত দফতর অভিযান করেন। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র সালানপুর লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেডস দেবসর বেসরা, লঘু হেমব্রম, সুনীল মুর্মু এবং রঞ্জিত হেমব্রম। পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর আয়ত্তাধীন দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এই কর্মসূচি এলাকার গরিব মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

স্বচ্ছ ভারত

পাঁচের পাতার পর

ম্যানুয়াল স্ক্যাভেনজিং বন্ধ করা হবে, ড্রাই ল্যাট্রিন করা হবে না। এরপর মহারাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করে এই ব্যবস্থা নির্মূল করবে। ভারতীয় সংবিধানের ২৫২ ধারায় পার্লামেন্ট এই উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তেমন ক্ষমতা আছে। অবশ্য রাজ্যের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তা করতে হবে। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ম্যানুয়াল স্কাভেনজিং নিষিদ্ধ করতে আইন পাশ করতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় কথাটাই বলতে হচ্ছে। বলাবাহুল্য আই এল ও কনভেনশন-থ্রি অনুযায়ী (ডিসক্রিমিনেশান ইন এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অকুপেশন) এই প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে। মাত্র সেদিন ১৯৯৩ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করে আইন হল। দি এমপ্লয়মেন্ট অব ম্যানুয়েল স্ক্যাভেনজারস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ড্রাই ল্যাট্রিনস (প্রোহিবিসন) অ্যাক্ট-১৯৯৩। এটা যে হল তার কারণ ৬টি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মর্মে আইন করতে অনুরোধ জানায়। মিনিস্ট্রি অব আরবান ডেভেলপমেন্ট থেকে নরসিমা রাও সরকারের আমলে প্রস্তুত খসড়াটি আলোচনার পর পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। আইন ভাঙলে ২০০০ টাকা জরিমানা এবং এক বছর জেল হবে। দুঃখের বিষয় ২০ বছরের মধ্যে আইনভঙ্গকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, জেলও হয়নি। সব চেয়ে বড় আইনভঙ্গকারী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রেলপরিবহণ বিভাগ— সেখানে এই ঘৃণ্য কারবার দিব্যি টিকে আছে।

এই হচ্ছে স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর দেশের নিচুতলার মানুষের অবস্থা। এরপর মোদিজির 'স্বচ্ছ ভারত' স্লোগানকে প্রহসনই মনে হয় না কি?

শরণার্থী সমস্যা

তিনের পাতার পর

সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিন যুদ্ধের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা টিকে থাকলে আয়লান কুর্দির মতো অসংখ্য শিশুর অমানবিক মৃত্যু থেকে দুনিয়ার মুক্তি নেই। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুবান আছে পুঁজিবাদী শোষণকে ভেঙে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে। তার জন্য লড়াই আয়লানদের হত্যার প্রকৃত জবাব হতে পারে। না হলে গভীর ব্যথা আর চোখের জল বার বার ব্যর্থই হবে।

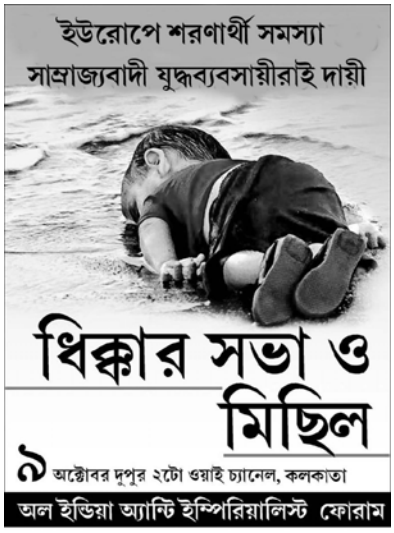

সাড়ে ৬ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নামছে

একের পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ সহ কোনও রাজ্যই ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের ধারেকাছেও যায়নি। গত বছরের অক্টোবরের মতো এ বছরেও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেলা হাসপাতালে ও মেডিকেল কলেজগুলিতে ফ্রি চিকিৎসা পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিজ্ঞ আমলাদের মন্তব্য, (চিকিৎসা) 'ফ্রি কিন্তু ফ্রি নয়'। বাস্তবে ফ্রি তো শুধু ঘোষণায় হতে পারে না। সরকারিভাবে টাকা বরাদ্দ করতে হবে। তা হচ্ছে কোথায়?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র সুপারিশ, জিডিপির ৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করতে হবে। এ দেশে কত বরাদ্দ করা হয়েছে? হয়েছে জিডিপি-র ১.০৪ শতাংশ, যা সরকারি মোট খরচের ৪ শতাংশ। এর বিরাট অংশ ব্যয় হয় প্রশাসনিক খরচ, বেতন প্রদান ইত্যাদিতে। ফলে ওষুধ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যয় হয় অতি সামান্যই। বাস্তবে ওষুধপত্র এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় সবই রোগীর পরিবারকে বাইরে থেকে করিয়ে দিতে হয়, যে কারণে সরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসার খরচ হাজার হাজার টাকা থেকে লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। যেমন, সম্প্রতি সংবাদে দেখা গেল এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের এক রোগীর খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দেড় লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া স্বাস্থ্যনীতি ২০১৫ পর্যন্ত স্বীকার করেছে প্রতি বছর ভারতের ৬ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। বহু পরিবার চিকিৎসা করাতে গিয়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই ৩০ লাখ মানুষ প্রতি বছর দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রে যে এত আত্মহত্যা তার পিছনে রয়েছে ঋণগ্রস্ততা। মহাজনদের কাছে যে চাষি ঋণ নিয়ে চাষ করল, তারপর ফসলের দাম না পেয়ে অথবা অনাবৃষ্টিতে সে নিঃস্ব এবং ঋণী হয়ে গেল। এতেই সে মৃত্যুর মুখে পৌঁছায়। আত্মহত্যা করে। এই মৃতপ্রায় চাষি পরিবারে অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার ব্যয়ভার তার পক্ষে বহন করা অসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ এই চিকিৎসার দায়দায়িত্বও সরকার নেয় না। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না। গোটা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

কেন চিকিৎসা করাতে গিয়ে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি চলে যাচ্ছে? অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স (এইমস)-এর ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া 'এশিয়ান এজ' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, চিকিৎসাক্ষেত্রে এখন ব্যবসার উত্তম জায়গা। হসপিটালগুলি (পড়ুন নার্সিং হোম) ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত হয় না, পরিচালনা করে কর্পোরেট মালিকরা। তাদের প্রধান লক্ষ্য হল ব্যবসা এবং মুনাফা।

স্বাস্থ্য নিয়ে মুনাফা করার এই সিংহদুয়ার ১৯৯১ সালে খুলে দিয়েছে মনমোহন সিংহের উদার অর্থনীতি। বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তীব্র বাজার সংকট থেকে সাময়িক ভাবে হলেও পরিত্রাণের আশায় পুঁজির বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করে এবং সেই মোতাবেক বিপুল অলস পুঁজির বিনিয়োগের জায়গা দিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ যাবতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারিকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বেসরকারি ক্ষেত্রের রমরমা অবস্থা সৃষ্টি করতে পরিকল্পিতভাবে সরকারি ক্ষেত্রে পরিষেবা ও কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আনা হয় সরকারি হাসপাতালে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ পলিসি। পাশাপাশি বেসরকারি নার্সিং হোমের অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু পুঁজির ধর্ম মুনাফা করা। সেটা করতে গিয়ে মুমূর্ষু রোগীকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আরও আর্থিক শোষণের জাঁতাকলে। এবং এটা আজ এত নগ্ন যে, সৎ ডাক্তাররা যথার্থই বলছেন, ডাক্তারি পেশা মহত্ত্ব হারিয়ে মুনাফার পাঁকে অধঃপতিত হয়েছে। জনস্বার্থে চিকিৎসা ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজনই মূল্যবোধসম্পন্ন চিকিৎসকের জন্ম দেয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই ভিত্তি ধ্বংস করলে যথার্থ চিকিৎসকও ধ্বংস হয়। পুঁজিবাদ সমস্ত পেশার মহত্ত্বকে যে এভাবে পুঁজির ক্লেদে মসীলিপ্ত করে, তার ইঙ্গিত বহু আগেই দিয়েছেন মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের রচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে'।

ভারতের মুনাফাচালিত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলি কী ভাবে রোগীর পরিবারের পকেট কাটছে, সে সম্পর্কে সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে কিছু ভয়ঙ্কর তথ্য বেরিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৭৮ জন খ্যাতনামা ডাক্তারের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি সেই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, হাসপাতাল মালিকের অতিমুনাফার লালসা মেটাতে 'অপ্রয়োজনীয়' ও 'ঝুঁকিপূর্ণ' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। জুপিটার হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের ডাক্তার বিজয় সুরাসে জানিয়েছেন, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, হৃদরোগ চিকিৎসা, পেটের চিকিৎসা, চোখের অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারাত্মক অনৈতিক ব্যবসা চলছে। তাঁর কথায়, রোগীদের ভয় এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কোনও কোনও ডাক্তার জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট অথবা হার্টের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং স্টেন্টিং প্রয়োজন না থাকলেও করাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, এসব ক্ষেত্রে সবসময় ডাক্তাররা দায়ী নয়, হাসপাতাল মালিক এবং ফার্মাসিউটিক্যাল এবং সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানির চাপও রয়েছে। তারা তাদের পণ্য বিক্রির বাজার তৈরি করার জন্য চাপ দিচ্ছে ডাক্তারদের উপর। রায়গড়ের ডাক্তার এইচ এস ভাস্কর জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের এক এম আর আই সেন্টার তাঁকে ১২০০ টাকার একটি চেক পাঠিয়েছে সেখানে রোগী পাঠানোর জন্য, যদিও তিনি কোনও রোগী পাঠাননি। এভাবে প্রভাবিত করার বিরুদ্ধে তিনি কোর্টে মামলা করেছেন। মুম্বইয়ের মহামারী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিনি ক্ষেত্রপাল জানিয়েছেন, সেখানে বিনা প্রয়োজনে সোয়াইন ফ্লু-র এইচ ওয়ান এন ওয়ান টেস্ট করানো হচ্ছে, যার জন্য ২৫০০ থেকে ৮০০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে ৮০০০ টাকা করে। কিছু হাসপাতালের কর্মীরা সাংবাদিকদের শুনিয়েছেন আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা। তাঁরা বলছেন, মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালগুলির অধিকাংশই ভর্তির দু'দিনের মধ্যেই নানা রকম টেস্টের মাধ্যমে বিরাট মুনাফা করে নেয়। তারপর তো রয়েছে ফাইনাল বিলের উপর ২০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ যা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যায় না। এছাড়াও রয়েছে রোগী শোষণের আরও নানা রকমারি ব্যবস্থা।

ভারতের বেসরকারি নার্সিংহোম শিল্প এখন হয়ে উঠেছে বিশ্বপুঁজির অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ ক্ষেত্র। ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে এই ক্ষেত্রে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হিসাবে দুই বিলিয়ন ডলার বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে। বিশ্বপুঁজির মালিকরা নার্সিংহোম শিল্পকে 'রিশেসন প্রুফ' (মন্দার সম্ভাবনাহীন) হিসাবেই মনে করছে। কিন্তু পুঁজির মুনাফার আগ্রাসন থেকে রোগী বাঁচবে কী করে? কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নন্দা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মন্ত্রক এ বিষয়ে সচেতন এবং নতুন যে স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করা হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে এসব নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের দাবিতে আন্দোলনরত ডাক্তারদের অভিমত, বিজেপি সরকারের প্রস্তাবিত নয়া স্বাস্থ্যনীতি বেসরকারিকরণের বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করবে। রোগী আরও মৃত্যুর দিকে এগোবে, পরিবার নিঃস্ব হবে আর্থিক শোষণে। বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এদিকেই ঠেলছে সাধারণ মানুষকে।

(তথ্যসূত্র ঃ এশিয়ান এজ ও টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২১ সেপ্টেম্বর '১৫ এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ সেপ্টেম্বর '১৫)

বাংলাদেশের রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবনের পক্ষে বিপজ্জনক

আগামী ১৬ - ১৮ অক্টোবর '১৫ তিন দিন ব্যাপী ঢাকা থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত রোড মার্চ। ডাক দিয়েছে বাংলাদেশের 'গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা'। বাংলাদেশের লুঠেরা পুঁজিপতি শ্রেণি ও ভারতীয় কোম্পানির মুনাফা লালসা থেকে সুন্দরবন সহ সুন্দরবনবাসীদের রক্ষা ও সর্বনাশা রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আহূত এই মার্চকে সামনে রেখে দেশব্যাপী দাবি উঠেছে— সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসীদের বাঁচতে দাও। দাবি উঠেছে— বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, কিন্তু সুন্দরবনের কোনও বিকল্প নেই, ফলে সুন্দরবন রক্ষার্থে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করো।

রামপালে বিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবন ধ্বংসের নীল নকশা

সুন্দরবনের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাটের রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছে আওয়ামি লিগের মহাজোট সরকার, বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে।

২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা ভারতে এসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১২ সালে ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (এন টি পি সি) এবং বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পিডিবি) এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদরা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিবেশগত যে ভয়াবহ বিপদ নিয়ে আসছে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ২০১৩-র ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যায় এবং তারপর সরকার প্রকল্পের কাজ চালিয়েই যাচ্ছে। ৫ অক্টোবর এক ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং রামপালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে পরের বছর অর্থাৎ ২০১৪-র ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ দপ্তর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। আর, এ বছর ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর কালে ৬ জুন রামপাল প্রকল্পের একটি মডেল তাঁর হাতে তুলে দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

বিপন্ন সুন্দরবন, বিপন্ন পরিবেশ

সুন্দরবন বিশ্বের মধ্যে একক ম্যানগ্রোভ অরণ্যের এলাকা হিসাবে সর্ববৃহৎ। একে রামসার অধীন এলাকা ও প্রাকৃতিক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানেই একমাত্র আছে বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এই বনভূমি অসংখ্য পশু-পাখি-মাছ সহ নানা জলজ প্রাণীর বাসভূমি। প্রাকৃতিক ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে বিপুল কৃষিজমি, জনপদ, পশু-পাখি ও আবহাওয়া মণ্ডলকে। বাংলাদেশ সরকারেরই বিভিন্ন দপ্তর সুন্দরবনের পাশে কয়লা-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে প্রথমে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। তাদের বনদপ্তর আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, এই বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হলে সুন্দরবনের জৈববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ও আপত্তি করেছিল।

সরকারের পরিবেশ দপ্তর যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল, তাতেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ, ড্রেজিং, ক্রমবর্ধমান জলযান ইত্যাদির কারণে রাসায়নিক পদার্থ ও তেল নিঃসরণের মতো কাজ সংশ্লিষ্ট নদীগুলিতে, সংযোগ খালে ও কৃষিতে মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলবে। ভূমিধস ঘটবে। মৎস্য চলাচল ও জৈববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গত ডিসেম্বরে (২০১৪) শেলা বা শ্যালা নদীতে সাড়ে তিন লক্ষ লিটার তেল ভর্তি জাহাজডুবির এবং এ বছরের জুলাই মাসে মরা ভোলা নদীতে ৭০০ টন পটাশ সার বহনকারী জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে ওই অঞ্চলের নদীগুলোর জলজ প্রাণী সহ আশপাশের পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মারাত্মক দূষণ ঘটায় বলে সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত বনভূমি ও বসতির ১৫ থেকে ২৫ কিমির মধ্যে কয়লা-বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় না। ইআইএ রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, প্রস্তাবিত রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে অবস্থিত, যে ভারতীয় এনটিপিসি বাংলাদেশে সুন্দরবনের পাশে এই নির্মাণ কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে, সেই ভারতেরই 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৭২' অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৫ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে বনাঞ্চল থাকা চলবে না। ভারতীয় পরিবেশ বন মন্ত্রালয়ের 'তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত গাইড লাইন, ১৯৮৭' অনুসারেও কোনও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিমির মধ্যে কোনও কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যায় না।

বাংলাদেশের 'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে, এনটিপিসি ভারতের ছত্তিশগড়ে একই পরিমাণ অর্থাৎ ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে এগোচ্ছিল। কিন্তু ভারতের পরিবেশ মন্ত্রকের গ্রিন প্যানেল এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে 'পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক' আখ্যা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটিকে বাতিল করা হয়। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেই একই ধরনের প্রকল্পকে কেমন করে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন দিল?

সুন্দরবন রক্ষায় দু-দেশের জনগণেরই সংঘবদ্ধ সংগ্রামে নামা দরকার

বাংলাদেশের 'গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা' মনে করে, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রধানত ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রকল্প। এর সাথে দু' দেশের জনগণের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি বাস্তবায়িত হলে দু' দেশেরই প্রকৃতি, পরিবেশ ও জনগণের সীমাহীন ক্ষতি হবে। অর্থাৎ এর ক্ষতিকর প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভারতের উপরও পড়বে। কারণ, সুন্দরবনাঞ্চলের তিন ভাগ রয়েছে বাংলাদেশে এবং এক ভাগ ভারতে। বাংলাদেশের বনাঞ্চল ধ্বংস হলে ভারতের সুন্দরবন ধ্বংস হতে বেশি সময় লাগবে না। সেই অর্থে, বাংলাদেশের জনগণের সুন্দরবন রক্ষার এই লড়াই ভারতের সুন্দরবনাঞ্চল রক্ষারও লড়াই। ইতিপূর্বে ভারতে সুন্দরবন ও রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল পার্কের পাশে একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু জনগণের প্রতিবাদের সামনে তারা পিছু হঠেছে। ভারত সরকারের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন সিপিএম সরকার সুন্দরবন এলাকার লোকালয় উচ্ছেদ করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল। এস ইউ সি আই (সি) এবং তাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা জনগণের কমিটি ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে তা প্রতিরোধ করেছে। রাজ্য সরকারের মদতে বহুজাতিক কোম্পানি সাহারা এসেছিল সুন্দরবন লাগোয়া বিশাল এলাকা জুড়ে পর্যটন কেন্দ্রের ব্যবসা করতে, যা বাস্তবে সুন্দরবনাঞ্চল ও তার নদী-সমুদ্রকে ভয়াবহ রকমে দূষিত করত এবং এতদঞ্চলের জনগণের জীবনে নোংরা সংস্কৃতির স্রোত বইয়ে দিত। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন ধ্বংসের সেই নীলনকশাও রুখে দেওয়া গেছে। এবার সুন্দরবন আক্রান্ত বাংলাদেশের দিক থেকে। সেখানে লড়ছে বাংলাদেশের জনগণ। তিন দিন ব্যাপী রোডমার্চের প্রস্তুতি চলছে সে দেশে।

আমরা জানি, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কাছে মুনাফা লুণ্ঠনই শেষ কথা। প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ, মানুষের জীবন-জীবিকা সবকিছু ধ্বংসের বিনিময়েও মুনাফা তাদের চাই। অন্য দিকে, শ্রমজীবী মানুষকে তার জীবন ও জীবিকা রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। না হলে তার অস্তিত্ব থাকে না। তাই, সুন্দরবন ধ্বংসকারী এই ভয়াবহ চক্রান্ত রুখতে দু' দেশেরই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। দু' দেশের জনগণেরই নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামা দরকার, উভয় দেশের সরকারগুলির জনবিরোধী সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করা দরকার।

নারী পাচারের স্বর্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ!

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ২০১৪ সালের তথ্য বলছে, পশ্চিমবঙ্গ কিশোরী পাচারের স্বর্গরাজ্য। সারা দেশে কিশোরী অপহরণ এবং গণিকালয়ে বিক্রির নথিভুক্ত ঘটনার ৪২ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গের। আরও আতঙ্কের খবর হল, গত পাঁচ বছরে এ রাজ্যে কিশোরী অপহরণ ৬০৮ শতাংশ বেড়ে গেছে। (১১ সেপ্টেম্বর, ১৫ হিন্দুস্থান টাইমস)

এ দায় কার? পূর্বতন সরকারের মতোই বর্তমান তৃণমূল সরকার তারস্বরে 'উন্নয়নের' সদম্ভ ঘোষণা করছে। কিন্তু এ কোন উন্নয়ন? কিশোরী পাচারে শীর্ষ স্থান দখলই কি তবে 'উন্নয়নের' নমুনা? শিশু শিক্ষায় নয়, চিকিৎসা পরিষেবায় নয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রথম দিকে ঠাঁই করে নিচ্ছে নারীপাচারে-শিশুপাচারে। কী লজ্জার! কোথায় চলেছে রাজ্য? কেন এই অধোগতি?

সম্প্রতি মুম্বইয়ের যৌনপল্লি থেকে উদ্ধার হয়েছে যে মেয়েরা, তার মধ্যে ১৫ জনই এ রাজ্যের। অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলির মেয়েদের 'কাজ' দেওয়ার লোভ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাচারকারীদের কবল থেকে ফিরে আসা গোসাবার এক তরুণী জানান, তাঁর বাবা দিনমজুরের কাজ করেন। বছর তিনেক আগে মা মারা যাওয়ায় পাশের গ্রামের এক 'কাকার' কথায় কাজের খোঁজে মুম্বই যান। দিন চারেক সেখানকার একটা বস্তিতে রাখার পরে এক দিন রাতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যৌনপল্লিতে। সেটাই ছিল তাঁর বাড়িঘর। এ রকম ঘটনা অসংখ্য।

বন্ধ চা বাগান, ভাঙন দুর্গত এলাকা কিংবা আদিবাসী এলাকায় কিশোরী মেয়েদের দুর্দশা আরও ভয়ঙ্কর। দারিদ্রের করাল গ্রাসের বলি হয়ে মান-প্রাণ সবই দিতে হয় এদের অনেককে। পেটের টানে কাজ করতে গিয়ে দালালের হাতে পড়ে প্রায়শই এক হাত থেকে আর এক হাতে বিক্রি হয়ে যায় এরা। হাত বদল হতে হতে কোথায় যে চলে যায়! অনেকের ঠিকানা অজানাই থেকে যায়। মুছে যায় তাদের নামটুকুও। সম্প্রতি কোচবিহারের দিনহাটার যৌনপল্লি থেকে পালিয়ে আসা বসিরহাটের এক তরুণী চোখের জলে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত সেই বর্ণনা পড়লে বিবেক শিউরে ওঠে।

এই অপরাধ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত মিলিয়ে ভয়ঙ্কর সংখ্যা। ভয়াবহ দারিদ্র এর অন্যতম কারণ হলেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা তা বাড়তে সাহায্য করছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নাটকীয় ঢংয়ে 'বেটি বাঁচাও' স্লোগান দিচ্ছেন, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প। কিন্তু বেটিরা বাঁচছে না, কন্যাদের জীবনে 'শ্রী'-র সংজ্ঞা মিলছে না।

নারী নির্যাতন ও পাচারে পশ্চিমবঙ্গের 'উন্নয়ন' পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলেই ঘটেছিল। সরকার পরিবর্তন হল। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাল না। ঘরে ঘরে মা-বোনেদের কান্না, দারিদ্রের জ্বালা রইল শুধু নয়, বেড়ে গেল বহুগুণ। গরিব, না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা এ শাসনেও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। এর ধাক্কায় বিপর্যয় নেমে এসেছে বহু নারীর জীবনে। নারী পাচারের বাড়বাড়ন্ত এখান থেকেই।

রাজ্য সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী কিশোরী পাচার সম্পর্কে বলেছেন, আগের সরকার এ নিয়ে কিছুই করেনি। আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি, বেশ কিছু প্রকল্প ঘোষণা করেছি। পাচার রোধে আরও কিছু দিন লাগবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বর্তমান সরকার বলে পূর্বতন দায়ী, পূর্বতন বলে বর্তমান— এভাবে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে চলছে দায় এড়ানোর পালা। এতে কি পাচার রোখা যাবে? কখনই নয়। নারী পাচার যেখানে একটা লাভজনক ব্যবসা এবং ক্রমবর্ধমান, তখন নিঃসন্দেহে এর পিছনে বড় চাঁইরা রয়েছে। প্রশাসন ইচ্ছা করলে এদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দিতে পারে। সর্বোপরি প্রয়োজন দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে গরিব পরিবারগুলিকে রক্ষা করা। পঞ্চায়েত-পুরসভার দখলদারি নিয়ে যত লড়ালড়ি, তার এক শতাংশ যদি এই ধরনের দারিদ্রপিষ্ট পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াবার জন্য ব্যয়িত হত, তবে হয়ত কিছু অসহায় মেয়েকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু মহান গণতন্ত্রের (!) এই দেশে তা দূরস্থান।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

কাশ্মীরের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

কেন্দ্রীয় কমিটি

কাশ্মীরের সোপোরে ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে তিন বছরের এক বালকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ২১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, বাস্তবে গত পাঁচ মাস ধরে উত্তর কাশ্মীরে রহস্যজনক অনেক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। অজ্ঞাতপরিচয় ঘাতকের দ্বারা এই নির্বিচার হত্যা, যাতে এমনকী শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না— স্পষ্ট করে দেখাচ্ছে সাধারণ নাগরিকের জীবন রক্ষায়, খুন-জখম নিয়ন্ত্রণে ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অপদার্থতায় পরিস্থিতির দ্রুত অবনমন ঘটছে এবং এসবই চলছে রাজ্যে মিলিটারি, প্যারামিলিটারি ও বিশাল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও।

কমরেড প্রভাস ঘোষ দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নিহতের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাবার পাশাপাশি বলেন যে, ক্রমবর্ধমান হিংস্রতা, সংঘর্ষ এবং হত্যার বিরুদ্ধে শূন্যগর্ভ আওয়াজ না দিয়ে এবং যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি না করে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করা, সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা।

বামফ্রন্ট সরকারের মিথ্যা মামলা খারিজ, ৫২ বিদ্যুৎ গ্রাহক নিঃশর্তে মুক্ত

বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে ২০০৫ সালের ২৭ অক্টোবর অ্যাবেকার নেতৃত্বে ৫ সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভ জানালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস এবং গুলি চালিয়ে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। ৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা কেস দেয়, ১৫ দিন জেল খাটার পর এই দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ওই ৫৪ জনকে হয়রানি করে। বামফ্রন্ট সরকার গুলিচালনার তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা না করে গ্রাহকদের উপর এই অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছে। অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে এই মিথ্যা মামলা সাজিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট শাসনের অবসানের পর তৃণমূল সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা সেই মামলা প্রত্যাহার করেনি। দুই সরকারের এই গ্রাহকস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলে ১০ বছর ধরে এই মিথ্যা মামলায় অ্যাবেকার নেতা-কর্মীদের উপর চূড়ান্ত হয়রানি চলেছে। ২২ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত কোর্টে অ্যাডিশনাল জেলা ও সেশন জজ শ্রী তপন মণ্ডল প্রমাণের অভাবে মামলা খারিজ করে অ্যাবেকার ৫৪ জনকে নিঃশর্ত মুক্তির আদেশ দেন। ইতিমধ্যেই এঁদের ২ জনের জীবনাবসান হয়েছে। উল্লেখ্য, আইনজীবী অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও সোমেন বিশ্বাস এই অন্যায় মামলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে জোরালো সওয়াল করেন।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী মুক্ত গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, এই মিথ্যা মামলা বিগত ও বর্তমান সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তিনি রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অ্যাবেকার সংগ্রামী নেতৃত্বের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আন্দোলনকে আরও তীব্র করার আহ্বান জানান।

কুলতলিতে কিশোর শিবির

১২-১৩ সেপ্টেম্বর কুলতলির সানকিজাহান কলোনিতে অনুষ্ঠিত হল কিশোর শিবির। ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং কমসোমলের উদ্যোগে কুলতলির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা তিন শতাধিক কিশোর-কিশোরীর অংশগ্রহণে এই শিবির হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। পি টি, খেলাধূলা, অঙ্কন কর্মশালা, ক্যারাটে প্রশিক্ষণ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, জিমন্যাস্টিক, গান, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন সৃজনশীল বিষয়ে কিশোর-কিশোরীরা অংশ নেয়। শিবিরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয়ের উপর আলোচনা করেন কমরেডস তপন রায়চৌধুরী, প্রবোধ পুরকাইত, সান্টু গুপ্ত, সৌরভ মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে

মহিলাদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনের সংশোধনী সম্পর্কে কলকাতায়

পূর্বভারতীয় সেমিনার

৭ অক্টোবর

মৌলালি যুবকেন্দ্র

মেমারিতে কৃষক বিক্ষোভ

শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, কৃষিঋণ ও বিদ্যুৎ বিল মকুব, ধানের সহায়ক মূল্য ১৮০০ টাকা ঘোষণা, সার-বীজ-কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও কালোবাজারি বন্ধ, ফসলের লাভজনক দাম এবং ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধের দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর মেমারি-২ বিডিও দপ্তরে শতাধিক কৃষকের অবস্থান বিক্ষোভ হয়। বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, কৃষি ও কৃষক বাঁচাও প্রস্তুতি কমিটির জেলা আহ্বায়ক দনা গোস্বামী ও অনিরুদ্ধ কুণ্ডু এবং মেমারি ২-ব্লকের পক্ষে সামসুল আহমেদ, কাজল চৌধুরী প্রমুখ।

সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহিদ রাজকুমার ভুল স্মরণে

সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহিদ রাজকুমার ভুল স্মরণে ২৬ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে সিঙ্গুরের গোপালনগর ঘোষপাড়ায় পালিত হল রাজকুমার ভুলের দশম শহিদ দিবস। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজকুমার ভুলের মা মীনা ভুল, সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শঙ্কর জানা, দলের হুগলি জেলা কমিটির সদস্য তপন দাস, স্থানীয় কৃষক ও কৃষক পরিবারের মা-বোনেরা।

রাজকুমার ভুলের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করছেন তাঁর মা মীনা ভুল

শঙ্কর জানা সিঙ্গুর আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। দলের স্থানীয় সংগঠক, সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সদস্য অমিতা বাগ বলেন, দশ বছর আগের এই দিনটার কথা মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে। ঠিক আগের দিনটা ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কায়দায় সমস্ত আলো নিভিয়ে, পুলিশ-র‍্যাফ-কমব্যাট ফোর্স দিয়ে সিপিএম সরকার সেদিন যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে ছিল, তা এক কথায় পৈশাচিক। ২৭ জন মহিলা, আড়াই বছরের শিশু পায়েল বাগ সহ ৭৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই অত্যাচারের শিকার হয়ে পুলিশের লাঠি আর বুটের আঘাতে আহত গোপালনগর ঘোষ পাড়ার ২৩ বছরের যুবক রাজকুমার ভুল ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর স্মরণ দিবসে আমরা মনে করি, সিঙ্গুরের মানুষ তাদের হারানো জমি ফেরত পেলে রাজকুমার ভুলের আত্মদান সার্থক হবে। রাজকুমার ভুলের মা সেটাই চান। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে গোপালনগর নিউ উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের সামনে শহিদ রাজকুমার ভুল ও শহিদ তাপসী মালিকের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

ঘাটশিলায় এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজনৈতিক ক্লাস

শরৎ সাহিত্যে প্রতিফলিত উন্নত মূল্যবোধের চর্চা ও যুবজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্য নিয়ে ৫-৭ সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় অনুষ্ঠিত হয় যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্যস্তরীয় শিক্ষা শিবির। আলোচ্য বিষয় ছিল শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্প এবং মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষের 'যুবসমাজের প্রতি' পুস্তিকাটি। বৈকুণ্ঠের উইল-এর প্রধান চরিত্র গোকুলের কোনও কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, গোকুলের মতো ছেলেরা বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়, বিনোদের মতো ছেলেরা হতে পারে না। আলোচিত হয় বেকার সমস্যা সহ যুবজীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি কেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই দিকটি নিয়েও। শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, বক্তব্য রাখেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত, প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড তমাল সামন্ত এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। এই শিবির উপস্থিত যুবকর্মীদের গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

হাউসস্টাফশিপ তুলে দেওয়ার বিরোধিতা সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের

হাউসস্টাফশিপ তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করল সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ১৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এই সিদ্ধান্ত রোগী এবং ডাক্তার উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। সম্প্রতি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জি ডি এম ও পদে চাকরির যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাউসস্টাফশিপ দরকার নেই বলা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত একজন ডাক্তারকে সমূহ বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেভাবে একজন মাত্র ডাক্তারকে সব দায়িত্ব সামলাতে হয়, সেখানে চাকরি শুরুর পূর্বে হাউসস্টাফশিপের মতো হাতেকলমে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে বিপর্যয় ঘটবে। হাউসস্টাফশিপ তুলে দিলে বড় হাসপাতালে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে থেকে কাজ শেখার অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তাররা বঞ্চিত হবেন, যা যথাযথ চিকিৎসাকে ব্যাহত করবে। তাঁরা বলেন, প্রতি বছর সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ না করে হাউসস্টাফশিপ আবশ্যিক কি না এই বিতর্ক তুলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার নিয়োগের রাস্তাই বন্ধ করা হচ্ছে। সমস্ত শূন্য পদে অবিলম্বে নিয়োগের দাবি জানান তাঁরা।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারও এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র বলেন, রাজ্য সরকার ভোটের আগে চমক দিতেই এভাবে চটজলদি ডাক্তার নিয়োগের কথা বলছে।

নন্দীগ্রামে রেলপ্রকল্প রূপায়ণের দাবি

নন্দীগ্রামের ঘোষিত রেল প্রকল্পের কাজ দ্রুত রূপায়ণ, বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার, বাস ও ট্রেকার ভাড়া কমানো, লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ বন্ধ, ভুয়ো বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে ১৭ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি) নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি। একটি সুসজ্জিত মিছিল নন্দীগ্রাম বাজার পরিক্রমা করার পর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এবং বিডিওকে স্মারকলিপি দেয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস অসিত প্রধান, অসিত জানা, মনোজ দাস, বিমল মাইতি সহ অন্যান্যরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org